নৈতিক শিক্ষা : প্রসঙ্গ *রামায়ণ*

চন্দনা রাণী বিশ্বাস*

সারসংক্ষেপ

নীতি বা নৈতিক শিক্ষা মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। মনুষ্যপ্রজাতি ছাড়া অন্য কোনো জী-বপ্রজাতির নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই। নৈতিক শিক্ষার অধ্যয়ন ও অনুশীলন সমগ্র জীবনব্যাপী একটা সাধনা। বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে নৈতিক শিক্ষার অধিক চর্চা হওয়া প্রয়োজন। সুপ্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে *রামায়ণ* একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। ঐতিহ্য-পরম্পরায় *রামায়ণকে* প্রথম মানবিক কাব্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। *রামায়ণের* প্রধান চরিত্র রামের মধ্য দিয়ে প্রত্যাশিত সমস্ত মানবিক গুণ, মূল্যবোধ তথা নৈতিক গুণাবলির সমন্বয় সাধিত হয়েছে। রামায়ণে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার অনুপম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই নৈতিক শিক্ষায় কেবল মানুষ নয়, প্রকৃতি ও জীবকুলের প্রতি আচরণের কথাও বলা হয়েছে। নাতিদীর্ঘ বর্তমান এই প্রবন্ধে রামায়ণে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক পর্যালোচিত হয়েছে।

নীতি বলতে সাধারণভাবে বোঝায় অনুশাসন বা হিত। [নীতি শব্দের ব্যুৎপত্তি নী + তি (ক্তিন্)] আর একটু প্রসারিত করলে বলা যায় 'অনুশাসনবাক্য' বা 'হিতকথা'। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত গল্পগ্রন্থ *হিতোপদেশ*-এর 'প্রস্তাবিকা'য় গ্রন্থপ্রণেতার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য – "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।" (*হিতোপদেশ*, ৮)। – কথাচ্ছলে বালকদের কাছে নীতিশাস্ত্রের কথা বলা হচ্ছে। কেন তিনি বালকদের প্রসঙ্গে একথা বলেছেন, তার উত্তর আছে এই শ্লোকার্ধের পূর্বার্ধে। "যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।" – যেমন নতুন (কাঁচা মাটির) পাত্রে অঙ্কিত কোনো চিহ্ন মুছে যায় না, তেমনি শিশুচিত্তে যে ছাপ পড়ে তা, অর্থাৎ বাল্যকালে অর্জিত সংস্কার দূরীভূত হয় না। *হিতোপদেশের* ঐ স্থান থেকে আরও দুটি শ্লোক উদ্ধার করছি :

> অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ।
> গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥ ৩

– প্রাজ্ঞজন যখন বিদ্যা ও অর্থ উপার্জন করবে তখন মনে করতে হবে তার জরা নেই, মৃত্যু নেই। আর ধর্মাচরণের সময় মনে করতে হবে মৃত্যু যেন তার কেশ ধরে আছে।

> সর্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্ ।
> আহর্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্বদা ॥ ৪

– সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই সর্বোত্তম। কারণ বিদ্যা অপহৃত হয় না। বিদ্যা অমূল্য ও অক্ষয়।

এখানে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে নীতি বা নীতিকথা বলতে কী বোঝায় তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

সকল দেশে সকল কালে সমাজকে সুস্থ ও সুস্থিত রাখতে নীতি বা নৈতিক শিক্ষার চর্চা লক্ষ করা যায়। প্রাচীন

*সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতে এই নৈতিক শিক্ষার চর্চা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার সকল সাহিত্যের মূল লক্ষ্য কোনো বিশেষ আদর্শ বা নৈতিক শিক্ষা অর্জন। প্রাচীন সে সময়ে এর জন্য পঠনীয় বিদ্যার নাম হয়েছে নীতিবিদ্যা বা নীতিশাস্ত্র।

রামায়ণ আদিকাব্য, প্রথম মানবিক কাব্য। – এটা সাধারণ বিশ্বাস; পরম্পরাপ্রাপ্ত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনন্য এক সৃষ্টি *রামায়ণ*।[১] মহাকবি বাল্মীকির এই রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, সমাজ, সভ্যতা, জীবন ও দর্শনের প্রতিচ্ছবি। এতে বিধৃত হয়েছে অজস্র নীতিকথা। কালান্তরেও এ সকল নীতিকথা আমাদের কাছে সমভাবে দীপ্যমান। আধুনিক এই সভ্যতার যুগেও *রামায়ণে* বিধৃত নৈতিক শিক্ষা আমাদের আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানায়। একজন আদর্শ মানুষের বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে, কীভাবে তিনি তাঁর মানবীয় গুণাবলি দ্বারা দেবত্বে উন্নীত হতে পারেন তারই অনুপম নিদর্শন *রামায়ণ*। রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের রামের প্রতি আনুগত্য, মমতাময়ী মহীয়সী মাতা সুমিত্রার কর্তব্যবোধে পুত্রের প্রতি উপদেশ দান, পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনগমন, রাম-সীতার দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে বাল্মীকি তাঁর *রামায়ণে* আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। *রামায়ণ-মহাভারত* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে: "ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"[২] এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন: *রামায়ণের* প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। ... কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া হয় নাই, সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।... গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। ... বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে"।[৩] সমগ্র *রামায়ণের* মধ্য দিয়ে বহুবিধ নৈতিক শিক্ষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই নৈতিক শিক্ষা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ক্রোধ মানুষের মহাশত্রু

ক্রোধের চেয়ে বড় শত্রু আর নেই। জল দিয়ে জ্বলন্ত আগুনকে নেভানোর মতো যাঁরা জাগ্রত ক্রোধকে প্রশমিত করে থাকেন, সেই মহাত্মারাই ধন্য। রেগে গেলে মানুষ কোন পাপই না করে থাকে? ক্রুদ্ধ হলে মানুষ গুরুজনদেরও হত্যা করে। ক্রোধী মানুষ রূঢ় বাক্যে সাধুদেরও অসংযত কথা বলে থাকে। বেশি রেগে গেলে কোনটা বলা উচিত এবং কোনটা বলা উচিত নয়, তা মানুষ আর বুঝতে পারে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির অকার্য কিছু নেই। অবাচ্যও কিছু নেই। বিপরীত দিকে যিনি ক্রোধ সংবরণ করে সকলকে ক্ষমা করতে পারেন তিনি যথার্থ মানুষ। এখানে উপমাসংযোগে স্মরণীয় উক্তি : সাপ যেমন তার জীর্ণ খোলস পরিত্যাগ করে, ঠিক সেভাবে ক্রোধ-উদ্রেকের মুহূর্তেই যিনি ক্ষমার দ্বারা তা দূর করতে পারেন, তিনিই পুরুষ পদবাচ্য।

ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো যে বুদ্ধ্যা কোপমুত্থিতম্ ।
নিরুন্ধন্তি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নিমিবাম্ভসা ॥
ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাৎ গুরূনপি।
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষিপেৎ ॥
বাচ্যাবাচ্যং প্রকুপিতো ন বিজানাতি কর্হিচিৎ।
নাকার্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে কৃচিৎ ॥
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষমৈয়ব নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ সুন্দর, ৫৫/৩-৬

ক্রোধের ভয়ঙ্কর দিকটি সবসময়েই পরিদৃষ্ট। তাই ক্রোধ সংবরণের উপদেশ সর্বকালেই প্রদত্ত হয়েছে। আমরা প্রায়শ দেখি, ক্রোধের বশে হিতাহিত জ্ঞান ভুলে অনেকে নিজের মা-বাবাকে পর্যন্ত হত্যা করে। ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করে। তাই ক্রোধ মানুষের মহাশত্রু। ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

কেননা ক্রুদ্ধ হওয়া মানে হেরে যাওয়া। তাই আমাদের সকলের উচিত ক্রোধ সংবরণ করা। ক্রোধকে জয়ের মাধ্যমে আত্মজয় হয়। আর আত্মজয়ের মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হয়।

মিত্ররূপী শত্রুর সাথে বাস করা অনুচিত

শত্রু ও ক্রুদ্ধসর্পের সঙ্গেও বাস করা যায়। কিন্তু দেখতে মিত্রের মতো অথচ শত্রুর সেবা করে যারা, তাদের সঙ্গে বাস করা উচিত নয়।

বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছত্রুসেবিনা ॥ যুদ্ধ, ১৬/২

'রামচন্দ্র অজেয়, তাই সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের কাছে প্রত্যর্পণ করা উচিত।' – রাবণের রাজসভায় বিভীষণ এই অভিমত প্রকাশ করেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এ প্রস্তাবে রাগান্বিত হয়ে কঠোর বাক্যে বিভীষণকে এই কথাগুলি বলেন।

কৃতঘ্নের নিষ্কৃতির কোনো বিধান নেই

মিত্রের দ্বারা উপকৃত হয়ে তার প্রতি প্রত্যুপকার যে করে না, সে কৃতঘ্ন। সে সর্বপ্রাণীর বধ্য। যে গো হত্যা করেছে, সুরাপান করেছে, যে চুরি করেছে এবং যে ব্রত শেষ পর্যন্ত করতে পারেনি – পণ্ডিতেরা তাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতির কোনো বিধান নেই।

পূর্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎপ্রতি করোতি যঃ।
কৃতঘ্নঃ সর্বভূতানাং স বধঃ প্লবগেশ্বরঃ ॥
গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥কিষ্কিন্ধা, ৩৪/১০,১২

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটা বোধ্য যে কৃতঘ্ন ব্যক্তি নিন্দনীয় এবং তাকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।

কর্মফল ভোগ

কুবের দুর্মতি রাবণকে উপদেশ দিয়েছেন, যে মাতা-পিতা, ব্রাহ্মণ ও আচার্যকে অবমাননা করে, সে যমের বশীভূত হয়ে সেইমতো কৃতকর্মের ফলভোগ করে। অনিত্য এই শরীর পেয়ে যে তপস্যার ফল অর্জন করে না, সেই মূঢ় ব্যক্তি মৃত্যুর পরে যখন তার কৃতকর্মের ফল পায়, তখন সে অনুশোচনাক্লিষ্ট হয়। রাজ্য, সম্পদ তথা ধন এবং সুখলাভ ধর্ম থেকেই হয়। অধর্ম থেকে কেবল দুঃখ লাভই হয়ে থাকে। তাই সুখের নিমিত্ত তুমি ধর্মাচরণ কর। পাপাচার থেকে বিরত হও। পাপের পরিণাম কেবলই দুঃখ। জগতে তা নিজেকেই ভোগ করতে হয়। তাই যে মূঢ় পাপ কার্য করে, প্রকারান্তরে সে নিজেকেই হত্যা করে। স্বেচ্ছামাত্র কোনো দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরই শুভবুদ্ধির উদয় হয় না। সে যেমন কর্ম করে, তেমন ফলই লাভ করে। সংসারে মনুষ্যগণ সমৃদ্ধি, মনোহর রূপ, বল, পুত্র-কন্যা, বৈভব ও বীরত্ব পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই লাভ করে।

মাতরং পিতরং বিপ্রমাচার্যঞ্চাবমন্যতে।
স পশ্যতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ ॥
অধ্রুবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোর্জনম্ ।
স পশ্চাত্তপ্যতে মূঢ়ো মৃতো গত্বাত্মনো গতিম্ ॥
ধর্মাদ্ রাজ্যং ধনং সৌখ্যমধর্মাদ্দুঃখমেব চ ।
তস্মাদ্ধর্মং সুখার্থায় কুর্যাৎ পাপং বিসর্জয়েৎ ॥
পাপস্য হি ফলং দুঃখং তদ্ ভোক্তব্যমিহাত্মনা।
তস্মাদাত্মাপঘাতার্থং মূঢ়ঃ পাপং করিষ্যতি ॥

কস্যচিন্ন হি দুর্বুদ্ধেশ্ছন্দতো জায়তে মতিঃ ।
যাদৃশং কুরুতে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে ॥ উত্তর, ১৫/২১-২৫

মানুষ তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করে – এই দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে সৎপথে চালিত করে। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা সমাজে পাপকর্ম করতে ভয় পায়। কেননা তারা জানে, 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' যারা সমাজে অকল্যাণ করে তাদের যদি এ বিষয়টি উপলব্ধি করানো যেত, তাহলে সমাজে পাপকর্ম অনেকাংশে লোপ পেত।

নিসর্গ রক্ষা ও জীবজন্তু সংরক্ষণে সচেতনতা

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাসে। রাজপুত্র ভরত সদলবল চলেছেন রামচন্দ্রের খোঁজে। যেভাবেই হোক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর মাতৃগণ, মন্ত্রিমণ্ডলি, রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ও বিশাল সৈন্যবাহিনী। অতিথিপরায়ণ গুহকের সহায়তায় তাঁরা গঙ্গা পার হলেন। অদূরেই ভরদ্বাজ ঋষির তপোবন। ক্রোশ মধ্যে তার দূরত্ব। এতক্ষণ সবাইকে নিয়ে চলছিলেন ধর্মজ্ঞ ভরত। কিন্তু এখন সবাইকে থামতে বললেন। পরিত্যাগ করলেন তিনি রাজকীয় বেশ। সশ্রদ্ধচিত্তে পরিধান করলেন পট্টবেশ ও উত্তরীয়। কেননা সম্মুখে ঋষি ভরদ্বাজের শান্ত-স্নিগ্ধ তপোবন। তাই তপোবনের স্নিগ্ধতা তিনি নষ্ট করতে চাইলেন না। শুধু রাজপুরোহিত বশিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে বিনীতবেশে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। বশিষ্ঠ ও রাজপুত্র ভরতকে দেখে এগিয়ে এলেন ঋষি ভরদ্বাজ। তিনি উভয়কে পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফল দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। ধর্মজ্ঞ ভরদ্বাজ অযোধ্যার সৈন্য, কোষ, মিত্র ও মন্ত্রীদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। রাজপুত্র ভরত তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দূরে রেখে এসেছেন। তাই ভরদ্বাজ ঋষি ভরতকে জিজ্ঞাসা করলেন – তোমার সৈন্যদের কেন এখানে আনলে না? কেন দূরে রেখে এলে? তখন ভরত তাঁকে বললেন : তারা আশ্রমের বৃক্ষ, জল, ভূমি এবং পর্ণশালাগুলির যাতে ক্ষতি না করে, সেজন্য আমি একাই এসেছি।

তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা।
ন হিংস্যুরিতি তেনাহমেক এবাগতস্ততঃ ॥ অযোধ্যা, ৯১/৯

ঋষি বশিষ্ঠ ও ভরত ভরদ্বাজ মুনির শারীরিক অবস্থা, যজ্ঞকর্ম, আশ্রমস্থ শিষ্য, বৃক্ষরাজি এবং পশু-পাখিদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

মুনি-ঋষিদের প্রতি রাজকুমার ভরতের বিনয় ও সৌজন্য এখানে লক্ষণীয়। গুরুজনের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তার একটি শিক্ষা এখান থেকে পাওয়া যায়। বর্তমানে দেখা যায় অনেক ধনী ব্যক্তি ধনের গর্বে গুণীজনের সঙ্গে উদ্ধত আচরণ করে। কিন্তু গুণীকে সম্মান করা, তাঁর প্রতি বিনয়ী হওয়া একজন সৎ মানুষের গুণাবলি। মানুষের পাশাপাশি তপোবনের বৃক্ষরাজি, পশু-পাখির প্রতি ভরতের সমাদর সমান গুরুত্ব পেয়েছে। এখানে নিসর্গ রক্ষা ও জীবজন্তু সংরক্ষণে ভরতের সচেতনতা ও মমত্ববোধের দিকটি বর্তমান যুগেও অনুসরণীয়। উল্লেখ্য, কেবল ভরতের দৃষ্টান্ত নয়, সমগ্র *রামায়ণে* প্রকৃতি-পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ পরিদৃষ্ট। বাল্মীকি তাঁর *রামায়ণে* প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুমাত্রিক সম্পর্ক ঘটিয়েছেন। আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করি। যতদিন না আমরা প্রকৃতিকে আপন আত্মীয় বলে মনে করব, ভরতের মতো প্রকৃতিপ্রেমী হব, ততদিন একটি বিশেষ দিবসে পরিবেশ দিবস পালন করে আমাদের কিছুই হবে না। আশার কথা, কিছু কিছু পরিবেশবাদী সংগঠন পরিবেশ সংরক্ষণে ভরতের উত্তরসূরিবৎ ভূমিকা পালন করছে।

স্বার্থপর মানুষের মন্ত্রণা গ্রহণ করা অনুচিত

ভরত-জননী কৈকেয়ী ছিলেন এক মমতাময়ী মা। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর ছিল গভীর স্নেহ। কেননা আমরা জানি, মন্থরার মুখে রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শুনে তখনই তিনি আনন্দে তাঁর কণ্ঠহার মন্থরাকে দিয়ে বলেছিলেন: এমন প্রিয় সংবাদে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। তোমাকে আরও কিছু দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কী নেবে বল? রামের অভিষেক হবে, রাম রাজা হবে, এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে? আমার কাছে ভরত আর রামে কোনো প্রভেদ নেই।

ইদং তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্ ।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে ॥
রামে বা ভরতে বাহ্হং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্ ।
তথা হ্যবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু ॥ অযোধ্যা, ৭/৩৪-৩৬

কিন্তু এর পরের ঘটনা খুবই ভয়ঙ্কর। স্বার্থপর মন্থরার কুমন্ত্রণায় সুন্দরমনা কৈকেয়ীর মনে চরম বিকৃতি ঘটে। *রামায়ণের* এই কাহিনির মাধ্যমে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে – সরল, মহৎ, সহানুভূতিশীল ব্যক্তিও কুটিল, স্বার্থপর লোকের সংস্পর্শে ও কুমন্ত্রণায় মুহূর্তের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তিত হয়। এমনকি পাপের পথে পা বাড়িয়ে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাই স্বার্থপর ও কুটিল প্রকৃতির লোকের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

শরণাগতকে রক্ষা করা পরমধর্ম

রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ। তিনি জ্ঞানী, সত্যের পূজারি ও আদর্শবান। সীতাকে রামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি রাবণকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু রাবণ তাঁর কথা শোনেননি। অগ্রজের এমন অধর্ম দেখে বিভীষণ লঙ্কা ছেড়ে রামচন্দ্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সুগ্রীবসহ অন্যান্য বানর বিভীষণকে সন্দেহ করেছে এবং রামচন্দ্রকে অনুরোধ করেছে তাকে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য। তখন শরণাগতবৎসল রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বললেন: হে পরন্তপ, কেউ যদি কৃতাঞ্জলি হয়ে দৈন্যের সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করে, সে যদি শত্রুও হয়, তবু তাকে ধর্মরক্ষার জন্যই হত্যা করবে না। শত্রু আর্তই হোক বা দৃপ্তই হোক, সে যদি শত্রুর শরণাগত হয়, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে প্রাণের বিনিময়ে সেই শত্রুকে রক্ষা করা। কেউ যদি ভয়ে, মোহে বা ইচ্ছা করে শরণাগতকে নিজের শক্তি অনুসারে যথাবিধি রক্ষা না করে, তাহলে সে পাপগ্রস্ত হয়, জগতে নিন্দিত হয়। রক্ষাকারীর শরণাগত হয়ে তার চোখের সামনে কেউ যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে সেই অরক্ষিত ব্যক্তি রক্ষাকারীর পুণ্যটুকু নিয়ে চলে যায়। শরণাগতকে রক্ষা না করলে ভীষণ দোষ হয়। 'আমি আপনার শরণ নিলাম' – এই কথা একবার মাত্র বলেও যে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, সকল প্রাণীর আক্রমণ হতে তাকে অভয় দিয়ে থাকি। এ আমার ব্রত।

বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্ ।
ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপ ॥
আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ ।
অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা ॥
ন চেদ্ভয়াদ্ বা মোহাদ্ বা কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি।
স্বয়া শক্ত্যা যথান্যায়ং তৎপাপং লোকগর্হিতম্ ॥
বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ ।
আদায় সুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ ॥
এবং দোষো মহানত্র প্রপন্না নামরক্ষণে।
অস্বর্গ্যং চাযশস্যঞ্চ বলবীর্যবিনাশনম্ ॥
করিষ্যামি যথার্থং তু কণ্ডোর্বচনমুত্তমম্ ।
ধর্মিষ্ঠঞ্চ যশস্যঞ্চ স্বর্গং স্যাত্তু ফলোদয়ে ॥
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে ।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥ যুদ্ধ, ১৮/২৭-৩৩

উল্লেখ্য, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন, আশ্রয়হীন হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ সমস্ত মৌলিক চাহিদা পূরণ করেছিল। তাদের বিপদে পাশে এসে

দাঁড়িয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের মধ্যেও অনেক সাধারণ মানুষ, পরিবার মুক্তিযোদ্ধাসহ অনেককে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। মানুষের এই মানবীয় দিকটি সর্বদা অনুসরণীয়।

পরার্থে আত্মত্যাগে জীবন সার্থক

বনগমনকালে লক্ষ্মণ নিজমাতা সুমিত্রার কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে যা বলেছিলেন, তা নৈতিক শিক্ষার এক আদর্শ নিদর্শন। সুমিত্রাদেবী লক্ষ্মণকে বলেন: আত্মীয়দের প্রতি তুমি খুবই অনুরক্ত। তবুও তোমায় আমি বনবাসের জন্য অনুমতি দিচ্ছি। তোমার দাদা রাম বনে যাচ্ছে। তাকে অনুসরণ না করে তুমি ভুল করো না। তোমার দাদা বিপদেই পড়ুক বা ঐশ্বর্যেই থাকুক, সেই তোমার আশ্রয়। ছোটভাই বড় ভাইয়ের বশীভূত হবে, জগতে এটাই হচ্ছে সজ্জনের ধর্ম। এইই হচ্ছে এ বংশের চিরন্তন সমুচিত সদাচার। দান, দীক্ষা, যজ্ঞ এবং যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনও এই বংশের পরম্পরা। রামচন্দ্রকে দশরথ মনে করবে, সীতাদেবীকে মনে করবে আমি, বনভূমিকে অযোধ্যা মনে করবে। বৎস, সানন্দে এবার এসো।

> রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্ ।
> অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥ অযোধ্যা, ৪০/৯

এখানে লক্ষণীয়, সুমিত্রাদেবীর অপর সন্তান শত্রুঘ্নও তাঁর কাছে থাকে না। শত্রুঘ্ন থাকেন ভরতের সঙ্গে তাঁর মামাবাড়ি কেকেয়রাজ্যে। তবুও তিনি মা হয়ে তাঁর সন্তানকে হাসি মুখে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমনের অনুমতি দিলেন। সন্তানের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ। কিন্তু তাঁর মাতৃস্নেহ ত্যাগে-শান্তিতে-সদাচারে সমুজ্জ্বল। মূলত তিনি সকলের সেবা ও শান্তিবিধানে অনুক্ষণ আত্মনিবেদিত। তাই স্বার্থসুখের আকাঙ্ক্ষা ও পুত্রবিচ্ছেদের শোক অগ্রাহ্য করেও তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁর পুত্রকে কর্তব্যপথে প্রেরণা দান করেছেন। সুমিত্রাদেবীর এই আত্মত্যাগের শিক্ষা বর্তমান সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। পরার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আছে স্বর্গীয় শান্তি – এই বোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারলে মানুষ শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে না। সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে তার কর্মক্ষেত্র হবে বৃহৎ। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

ভ্রাতৃপ্রেম

অসীম ভ্রাতৃপ্রেমের অপূর্ব কাহিনি রামায়ণে উল্লেখিত। রাজা দশরথের চার পুত্র রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ছিলেন অভেদাত্মা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি ছিলেন স্নেহশীল। ভাইদের নিয়েই তাঁর সুখ। রামচন্দ্র নিজেই লক্ষ্মণকে বলেছেন: যেখানে ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ থাকবে না, এমন বস্তু তা সে যত সুখেরই হোক, তা যেন আগুনে ছাই হয়ে যায়।

> যদ্ বিনা ভরতং ত্বাং চ শত্রুঘ্নং বাপি মানদ।
> ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী ॥ অযোধ্যা, ৯৭/৮

লক্ষ্মণ ছিলেন একান্ত রামগতপ্রাণ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তাঁর সর্বস্ব। রামচন্দ্রের বনগমনের সংকল্প জেনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে লক্ষ্মণ বলেন: যদি বনে যাওয়াই স্থির করে থাকেন, তাহলে ধনুর্বাণ ধারণ করে আমি আপনার আগে আগে যাব। আপনাকে ছেড়ে আমি দেবলোক, অমরত্ব, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য কিছুই চাই না। লক্ষ্মণ হাসিমুখে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যান। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনগমনের সময় ভরত-শত্রুঘ্ন কেকেয় রাজ্যে অবস্থান করছিলেন। ভরত অযোধ্যায় ফিরে এসে জানতে পারেন মূলত তাঁকেই রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য তাঁর মাতা কৈকেয়ীর ইচ্ছায় রামচন্দ্রকে বনবাসী হতে হয়েছে। ভ্রাতৃশোকে তখন তিনি কাতর। তিনি তাঁর মাতৃগণ, গুরু বশিষ্ঠ ও অন্য গুরুজনসহ রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে বনে যান। সত্যব্রত রামচন্দ্র অনেক যুক্তি সহকারে ভরতকে বোঝালেন যে তিনি কখনও পিতার সত্যভঙ্গ করবেন না। স্নেহবিহ্বল রামচন্দ্র ভরতকে আলিঙ্গন করে বললেন: ভরত, তুমি বুদ্ধিমান, বিনয়ী। রাজ্যশাসনে তুমিই সুযোগ্য। মন্ত্রী অমাত্যদের পরামর্শ ও সাহায্য নিয়ে তুমি রাজকার্য পরিচালনা করো। মাতা কৈকেয়ীর প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করো না। আমার ও সীতার নামে শপথ করে বলছি তুমি মাতার প্রতি রুষ্ট হয়ো না।

কামাদ্ বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্ ।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ ॥
মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মাং রোষং কুরুতাং প্রতি।
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোহসি রঘুনন্দন। অযোধ্যা, ১১২/১৯, ২৭-২৮

এভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসেবে রামচন্দ্র ভরতের মনের দুঃখ-গ্লানি দূর করার চেষ্টা করলেন। তখন ভরত রামের চরণ ধরে বললেন: আর্য, এই স্বর্ণভূষিত পাদুকায় আপনার চরণ রাখুন। এই পাদুকা সর্বলোকের কল্যাণ ও মঙ্গল বিধান করবে। এই পাদুকায় রাজ্যভার অর্পণ করে, জটাচীরধারী সন্ন্যাসী হয়ে কেবল ফলমূল আহার করে, নগরের বাইরে আমি আপনার জন্য চৌদ্দ বছর অপেক্ষা করব।

অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ॥
স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্ ॥
ফলামূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্ বহিঃ ॥ অযোধ্যা, ১১২/ ২১,২৩-২৪

ভরত সিংহাসনে রামচন্দ্রের পবিত্র পাদুকা স্থাপন করে, সেই পাদুকায় সব কিছু নিবেদন করে চৌদ্দ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এখানে ভরতের ভ্রাতৃভক্তি অতুলনীয়। তিনি ভ্রাতৃগত প্রাণ হয়ে ভ্রাতার সুখে সুখী, ভ্রাতার দুঃখে দুঃখী হয়েছেন। ভ্রাতার বনবাসে নিদারুণ ব্যথিত হলেও তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট হননি। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছেন। ভ্রাতাদের অভিন্নহৃদয় অনুভব করে রাজৈশ্বর্যের মধ্যে, রাজকার্যের গুরুদায়িত্বে থেকেও বনবাসী ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় জটাচীরধারী হয়ে তপস্বীর জীবন-যাপন করেছেন। ত্যাগে, মহত্ত্বে, উদারতায়, অনাসক্তিতে, ভোগ-নিঃস্পৃহতায়, কর্তব্যপালনে ভরত রামচন্দ্রেরই যেন প্রতিমূর্তি। এখানে লক্ষণীয়, অগ্রজ যেমন অনুজের প্রতি অপরিসীম স্নেহশীল, তেমনি অনুজের কাছে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমশ্রদ্ধার পাত্র। *রামায়ণের* এই পারিবারিক শিক্ষা বর্তমান যুগে অত্যন্ত প্রয়োজন। ভাইদের পারস্পরিক এমন মধুর সম্পর্ক পারিবারিক জীবনে স্বর্গীয় শান্তি বয়ে আনে। তাই এখনও মানুষের মধ্যে উত্তম ভ্রাতার আকাঙ্ক্ষা হলো – রামের মতো অগ্রজ, আর ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নর মতো অনুজ।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

রামচন্দ্র বনগমনের পর শোকগ্রস্ত রাজা দশরথ রামজননী শোকক্লিষ্টা কৌসল্যার কাছে এসেছেন। রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে স্মরণ করে দুঃখে বিলাপ করছেন। রামজননী কৌসল্যার অবস্থা তখন বৎসহারা গাভীর মতো। রামের শোকে বিলাপ করতে করতে ধর্মপরায়ণা কৌসল্যার চিত্তে জেগে উঠেছে ক্রোধ। শোকক্লিষ্টা ক্রুদ্ধা রামজননী কর্কশবাক্যে রাজা দশরথকে অভিযুক্ত করলেন। তখন রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলি হয়ে কৌসল্যাকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন: দেবী কৌসল্যা, প্রসন্ন হও। এই করজোড়ে বলছি, তুমি নিত্যই অপরের প্রতি স্নেহময়ী ও সহৃদয়া। তুমি তেমনই ধর্মপরায়ণা নারী। দুঃখে পড়েও অধিক দুঃখিত আমাকে তুমি এইরকম অপ্রিয়বাক্য বলতে পার না।

প্রসাদয়ে ত্বাং কৌসল্যে রচিতো'য়ং ময়াঞ্জলিঃ।
বৎসলা চানৃশংসা চ ত্বং হি নিত্যং পরেষ্বপি॥
সা ত্বং ধর্মপরা নিত্যং দৃষ্টলোকপরাবরা।
নার্হসে বিপ্রিয়ং বক্তুং দুঃখিতাপি সুদুঃখিতম্ ॥ অযোধ্যা, ৬২/৭-৯

তখন ক্রন্দনরত দেবী কৌসল্যা রাজা দশরথের অঞ্জলিবদ্ধ হাতদুটি মাথায় তুলে নিয়ে বললেন: আমি মাটিতে পড়ে আপনার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলছি, আপনি প্রসন্ন হোন। আপনার আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত নয়। অথচ আপনি তাই করলেন। দেব, এতে যে আমি মারা গেলাম। সংসারে সেই স্ত্রী যথার্থ হয় না – যে প্রশংসনীয়, ধীমান পতির দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে এভাবে প্রসাদিত হয়।

প্রসীদ শিরসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে।
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং নহি ত্বয়া ॥
নৈষা হি সা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন ধীমতা।
উভয়োর্লোকয়োর্লোকে পত্যা যা সংপ্রসাদ্যতে ॥ অযোধ্যা, ৬২/১২-১৩

এখানে স্বামী-স্ত্রীর যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তা অতুলনীয়। রাম-সীতা ছিলেন দাম্পত্যপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সীতা ছিলেন রামচন্দ্রের প্রকৃত সহধর্মিণী। সীতা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, পত্নীই পতির ভাগ্য পায়। তাই রামচন্দ্রের বনবাসবার্তা শ্রবণে সীতা রামচন্দ্রকে বলেছিলেন: আমি তোমার সহধর্মিণী, তোমার সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী। অতএব তোমার সঙ্গে আমিও বনে যেতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তোমার বিরহে জীবনধারণ করতে পারব না। আমি তোমার সঙ্গে বনে সুখে বাস করব। ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভাবব না, পতিসেবা ও পতির হিতচিন্তাই করব। তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও বাস করতে চাই না।

শুশ্রূষমানা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু ॥
স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে ॥ অযোধ্যা, ১৭/১৩,২১

রামচন্দ্র ছিলেন পত্নীপ্রেমে একনিষ্ঠ একজন আদর্শ স্বামী। সীতাহরণের পর সীতাবিরহে তিনি বিলাপ করে লক্ষ্মণকে বলেছেন: লক্ষ্মণ, সীতা আমার বৈষয়িক কার্যে মন্ত্রণাদাত্রী, সেবাকার্যে দাসী, ধর্মকার্যে সহধর্মিণী, ক্ষমায় ধরিত্রী, স্নেহে মাতৃতুল্য, আমার চিত্তবিনোদনকারিণী সখী।

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রামা রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে ॥ অরণ্য

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। *রামায়ণের* এই আদর্শ দাম্পত্যপ্রেম বর্তমানকালের দম্পতিদেরও অনুকরণীয় আদর্শ।

রাজধর্ম পালনে আত্মত্যাগ

রামচন্দ্র ছিলেন সকল আদর্শের প্রতিমূর্তি। তিনি যেমন আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ মিত্র, আদর্শ প্রভু, আদর্শ পতি – তেমনি আদর্শ রাজা। পতির পত্নীর প্রতি, পুত্রের মাতা-পিতার প্রতি, ভ্রাতার ভ্রাতার প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু রাজার দায়িত্ব সকল মানুষের কল্যাণসাধন – যে দায়িত্বের নিকট অন্য সব দায়িত্ব ছোট হয়ে যায়। রামচন্দ্রের সহধর্মিণী দেবী সীতা। সীতাদেবীকে রামচন্দ্র প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। প্রজানুরঞ্জনে রাজা রামচন্দ্র তাঁর সীতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। সীতাকে বিসর্জন দিয়ে রামচন্দ্রের হৃদয়ে দুঃখের আগুন জ্বলেছে প্রতিক্ষণ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বর্ণসীতাকে পাশে রেখে রামচন্দ্র তাঁর রাজধর্ম পালন করেছেন। নৃপতিসত্তার বেদিমূলে রামচন্দ্রের স্বামীসত্তা বিসর্জিত হয়েছে। সীতাকে বিসর্জন দিয়ে কঠোরভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। যে সীতা হরণের পর রামচন্দ্রের হাহাকার ধ্বনিতে পঞ্চবটীর আকাশ-বাতাস কেঁদেছিল – সেই সীতাকে বিসর্জন দিতে রামচন্দ্রের কত কষ্ট হয়েছে, এটা বোঝার জন্য হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন। "সীতার প্রতি কি সুগভীর বিশ্বাস ও সুদৃঢ় প্রেম থাকিলে, প্রজাসমাজে আদর্শ-শুদ্ধি রক্ষার জন্য প্রজারঞ্জন-ব্যপদেশে সীতাকে ত্যাগ করা সম্ভবপর হয় এবং রামচন্দ্রের প্রতিও কি সুগভীর বিশ্বাস ও সুদৃঢ় প্রেম থাকিলে, দয়িতের হস্ত হইতে রাজবিধানকে দৈববিধান বলিয়া মান্য করা যায় – তাহা বুঝা ক্ষীণদৃষ্টি ও ক্ষীণপ্রাণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।" (আমাদের পরিচয়, পৃ. ৪৬)

দেবী সীতাকে বিসর্জন দিয়ে রামচন্দ্রের আত্মসুখ বিঘ্নিত হয়েছে। পতিধর্ম বড়, কিন্তু রাজধর্ম আরও বড়। প্রজাদের সুখ মানে পরার্থে সুখ। আত্মসুখের বিসর্জন দিয়ে রামচন্দ্র পরার্থে রাজধর্ম পালন করেছেন। এখানেই রাজা রামের মহত্ত্ব। "... সে সুরের রেশ আজিও ভারতবাসীকে বাঙ্গালীকে চঞ্চল করে, উন্মনা করে, মোহ চূর্ণ করিয়া কঠিন

কর্তব্যসাধনে তাহার চিত্তকে দৃঢ় করে, জীবনের অনিবার্য্য দুঃখকে প্রসন্নভাবে গ্রহণ করিবার উপযোগী বৈরাগ্য ও বীরত্ব দান করে; ভোগ নয়, ত্যাগদ্বারা ও সংযমদ্বারা সংসার ও রাষ্ট্রকে ধারণ করিবার শক্তি দেয়।" (আমাদের পরিচয়, পৃ. ৪০)

ক্ষমা পরম ধর্ম

লঙ্কাজয়ের পর হনুমান রামচন্দ্রের বিজয়বার্তা শোনাতে সীতাদেবীর কাছে গেলেন। সীতাদেবীর চারদিকে তখন রাক্ষসীরা। তিনি নিরানন্দভাবে বসে আছেন। হনুমান তাঁকে প্রণাম করে রামচন্দ্রের বিজয়বার্তা জানালেনঃ হে দেবী, আজ এই বিজয় লাভ হয়েছে। এখন স্বস্থ হও। মনোবেদনা ত্যাগ কর। শত্রু রাবণ নিহত হয়েছে। লঙ্কা আমাদের বশীভূতা।

> লব্ধো' য়ং বিজয়ঃ সীতে স্বস্থা ভব গতজ্বরা।
> রাবণশ্চ হতঃ শত্রুর্লঙ্কা চৈব বশীকৃতা ॥ যুদ্ধ, ১১৩/১০

হনুমান সীতাকে এই সংবাদ দিলে অতি হর্ষে দেবী সীতার বাক্‌স্ফূর্তি হলো না। তখন হনুমান বললেনঃ দেবী, আপনি কী চিন্তা করছেন? আমার সঙ্গে কথাও বললেন না যে!

> ততোহব্রবীদ্ধরিবরঃ সীতামপ্রতিজল্পতীম্ ।
> কিং ত্বং চিন্তয়সে দেবি কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে ॥ যুদ্ধ, ১১৩/১৫

সীতাদেবী তখন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বললেনঃ হে মহাবীর, পৃথিবীতে এমন কোনো ধন-রত্ন দেখি না যা দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করতে পারি। ত্রিলোকের রাজ্যও তোমার যোগ্য পুরস্কার নয়।

> ন হি পশ্যামি সদৃশং চিন্তয়ন্তী প্লবঙ্গম।
> আখ্যানকস্য ভবতো দাতুং প্রত্যভিনন্দনম্ ॥
> ন হি পশ্যামি তৎ সৌম্য পৃথিব্যাং তব কিঞ্চন।
> সদৃশং যৎপ্রিয়াখ্যানে তব দত্ত্বা ভবেৎ সুখম্ ॥ যুদ্ধ, ১১৩/১৮-১৯

তারপর হনুমান সীতার প্রতি তর্জনকারিণী রাক্ষসীদের শাস্তি দিতে চাইলেন। হনুমান সীতাকে বললেনঃ আপনার অনুমতি পেলে আপনাকে যারা পীড়ন করেছে, সেই রাক্ষসীদের আমি শাস্তি দিতে চাই।

> ইমাস্তু খলু রাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে।
> হন্তুমিচ্ছামি তাঃ সর্বা যাভিস্ত্বং তর্জিতা পুরা ॥ যুদ্ধ, ১১৩/৩০

তখন করুণাময়ী, দীনবৎসলা, ক্ষমাশীলা সীতাদেবী হনুমানকে বললেনঃ রাজার আশ্রয়ে যারা থাকে, রাজ-আজ্ঞায় তাদের কাজ করতে হয়। তারা তো দাসীমাত্র, পরাধীনা। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তাদের ওপর কে রাগ করবে? পূর্ব জন্মের দুষ্কৃতি এবং ভাগ্যদোষেই আমার এই দুর্গতি। আমার নিজেরই কৃতকর্মের ফল আমি এভাবে পেয়েছি। ভোগও করেছি। হে মহাবীর, এরকম বলো না। দৈবেরই এই পরমাগতি। আমি নিশ্চিত যে, দশা অনুসারে ফল পেতেই হবে। রাবণের দাসীরা দুর্বলা। তাদেরকে আমি ক্ষমা করেছি। রাক্ষস রাবণের দ্বারা আদিষ্ট হয়েই রাক্ষসীরা আমায় পীড়ন করেছে।

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন শেষ। অপরূপ সাজে সজ্জিত অযোধ্যা নগরী। সবার মনে আনন্দ। কিন্তু দুর্মতি মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী কীভাবে রাজা দশরথকে বরদানে মোহগ্রস্ত করেছে – সে কথা প্রত্যেক *রামায়ণ* পাঠকের জানা আছে। রাজা দশরথকে পূর্ব প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করে কৈকেয়ী চেয়ে নিলেন দুটি বর।

প্রথম বরঃ রামচন্দ্রের নয়, ভরতের হবে রাজ্যাভিষেক।

দ্বিতীয় বর: চৌদ্দ বছরের জন্য রামচন্দ্রের বনবাসে নির্বাসন।

কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় রাজা দশরথ শোকে মুহ্যমান। তিনি রামচন্দ্রকে বললেন: বৎস রাম, কৈকেয়ীকে বরদানে আমি মোহগ্রস্ত হয়েছি। আমাকে জোর করে সরিয়ে তুমিই অযোধ্যার রাজা হও।

অহং রাঘব কৈকেয্যা বরদানেন মোহিতঃ।
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্ ॥ অযোধ্যা, ৩৪/২৬

কিন্তু রামচন্দ্রের কাছে সত্যই বড় তপস্যা। তাই তিনি তার পিতাকে বললেন: আমি রাজ্য চাই না। সুখ চাই না। এমন কি পৃথিবীও চাই না। কামনার এইসব বস্তু চাই না। স্বর্গ চাই না, এমন কি জীবনও চাই না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমি মিথ্যা থেকে মুক্ত করে সত্যপ্রতিষ্ঠ করতে চাই। এই আমি আপনার সামনে সত্য ও পুণ্যের নামে শপথ করে বলছি।

নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্ ।
নৈব সর্বানিমান্ কামান্ন স্বর্গং ন চ জীবিতুম্ ॥
ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি নানৃতং পুরুষর্ষভ।
প্রত্যক্ষং তব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে ॥ অযোধ্যা, ৩৪/৪৭-৪৮

পিতৃসত্য পালনার্থে রামচন্দ্র সানন্দে বনে গমন করেছিলেন।

বনবাসে অবস্থানকালে ভরত রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে গেলেন। ঋষি জাবালি অনেক যুক্তি দিয়ে রামচন্দ্রকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে রামচন্দ্রের অযোধ্যায় ফিরে যাওয়া উচিত। জাবালির যুক্তিকে খণ্ডন করে রামচন্দ্র যে মত স্থাপন করেন, তা ছিল সম্পূর্ণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রামচন্দ্র সত্যের স্বরূপকে কীভাবে উপলব্ধি করেছেন, তার অনেক দৃষ্টান্ত এখানে প্রদর্শিত হলো।

সত্যই ঈশ্বর। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। সবকিছুর মূলে রয়েছে সত্য।

সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥ অযোধ্যা, ১০৯/১৩

মিথ্যা দ্বারা কখনও সত্য রক্ষিত হয় না। সত্য দ্বারাই সত্য রক্ষিত হয়। রামচন্দ্র বলেছেন: আমি সত্যকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করি। এই সত্য রক্ষার ভার বহনের জন্যই সৎপুরুষেরা জীবনের যা কিছু আহরণ করেন। সত্যের জন্যই তাঁরা অভিনন্দিত হন।

প্রত্যগাত্মমিমং ধর্মং সত্যং পশ্যাম্যহং ধ্রুবম্ ।
ভারঃ সৎপুরুষৈশ্চীর্ণস্তদর্থমভিনন্দতে ॥ অযোধ্যা, ১০৯/১৯

আমি পিতৃনির্দেশ কেন পালন করব না? আমি সত্যকে আশ্রয় করে সত্য পালন করব – এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সো'হং পিতুর্নিদেশং তু কিমর্থং নানুপালয়ে।
সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যং সত্যেন সময়ীকৃতম্ ॥ অযোধ্যা, ১০৯/১৬

যদি চন্দ্র থেকে জ্যোৎস্না চলে যায়, হিমালয় যদি হিম ত্যাগ করে, যদি সমুদ্র তটভূমি অতিক্রম করে – তবুও আমি পিতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না।

সত্যকে জীবনের পরম ধর্ম মেনেই রামচন্দ্র তাঁর জীবনে সমস্ত নীতি অনুসরণ করেছেন। সমাজ ও জীবনকে সত্যের কঠোর শাসনে বেঁধেছেন। সত্যের বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে গিয়ে তিনি সানন্দে দুঃখকে বরণ করেছেন। এই সত্য নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে তাঁর জীবনে বার বার এসেছে। যেমন লক্ষ্মণ-ত্যাগ।

রামচন্দ্রের জীবনের শেষ দিক। একদিন মহাকাল একজন তাপসরূপে রামচন্দ্রের কাছে এলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত গোপন কথা আছে। ছদ্মবেশী মহাকাল রামচন্দ্রকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন: তাঁদের দুজনের বৈঠকের সময় কেউ তাঁদের সামনে আসতে পারবে না। যে ভেতরে প্রবেশ করবে, তাকে হত্যা করতে হবে। রামচন্দ্র সম্মত হলেন।

তিনি লক্ষ্মণকে বললেন: তুমি নিজে দ্বারে পাহারা দাও। কাউকে ভেতরে আসতে দিও না। যে ভেতরে আসবে, তাকে হত্যা করা হবে।

ছদ্মবেশী মহাকাল ও রামচন্দ্রের বৈঠক চলছে। একটু পরে ঋষি দুর্বাসা এলেন। তিনি প্রহরারত লক্ষ্মণকে বললেন: এই মুহূর্তেই আমি রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করব। তাঁকে আমার আগমনবার্তা পৌঁছে দাও। তখন লক্ষ্মণ তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। লক্ষ্মণের কথা শুনে ঋষি দুর্বাসা ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন: এখনই রামচন্দ্রকে সংবাদ পাঠাও। বিলম্ব করলে তোমাদের রাজ্য, তোমরা সবাই সবংশ ভস্ম হয়ে যাবে। তখন লক্ষ্মণ ভাবলেন: সকলের বিনাশ না হয়ে বরং আমার বিনাশ হোক। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে ঋষি দুর্বাসার আগমনের বার্তা জানালেন। লক্ষ্মণকে দেখে রামচন্দ্র বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়ল মহাকালের প্রতিজ্ঞার কথা। তখন শোকে-দুঃখে করুণ-ম্লান হলো তাঁর মুখখানি। রামচন্দ্র ভাবলেন: মহাকাল তাঁর জীবনে একি কঠোর পরীক্ষা নিতে এলেন! তিনি কি ভ্রাতৃহন্তা হবেন? না কি সত্যভ্রষ্ট হবেন? ঋষি বশিষ্ঠ তাঁকে সমাধান দিলেন: হে পুরুষোত্তম, লক্ষ্মণকে তুমি ত্যাগ করো। নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না। কেননা, অঙ্গীকার বিনষ্ট হলে ধর্ম নষ্ট হয়।

> ত্যজৈনং বলবান্ কালো মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।
> প্রতিজ্ঞায়াং হি নষ্টায়াং ধর্মো হি বিলয়ং ব্রজেৎ ॥ উত্তর, ১০৬/৯

আজীবন সত্যের পূজারি রামচন্দ্র এবার সত্য রক্ষার্থে নিজেকেই বলি দিলেন। লক্ষ্মণ তাঁর আত্মসম, দ্বিতীয় প্রাণ। সেই প্রাণাধিক ভাইকে তিনি বললেন: সৌমিত্রি, ধর্মের বিপর্যয় করা উচিত নয়। তাই তোমাকে আমি ত্যাগ করছি। কেননা সাধুজনের পক্ষে নিধন অথবা পরিত্যাগ উভয়ই সমান।

> বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্মবিপর্যয়ঃ।
> ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্ ॥ উত্তর, ১০৬/১৩

সত্যই সুন্দর, সত্যই মহান – *রামায়ণের* এই নৈতিক শিক্ষা চিরকালের জন্য অনুসরণীয়। সত্যপথে চলতে জীবনে অনেক দুঃখ আসতে পারে, কিন্তু মহান ব্যক্তিরা সত্যরক্ষার জন্য দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করেন। সত্যপথে চলা সহজ নয়, যথেষ্ট কঠিন। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে উপলব্ধি করেছেন ঠিক এভাবে:

> সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
> সে কখনও করে না বঞ্চনা। (রূপ নারাণের কূলে, *শেষলেখা*)

পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অবশ্য পালনীয়

কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা অবশ্যই পালন করা উচিত। মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যার রাজসভায় আগমন করলে রাজা দশরথ তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন – মহর্ষি যা কামনা করবেন, তিনি তা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করবেন। কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার্থে রামচন্দ্রকে কামনা করলেন – তখন রাজা দশরথ রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য সবকিছু মহর্ষিকে দিতে চাইলেন। এ সময় মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বললেন: মহারাজ, আপনি ধর্মের অপরমূর্তি। আপনার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে না করলে ইষ্টাপূর্তের বিনাশ হয়। তাই আপনি রামকে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে ধর্ম পালন করুন।

> ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ।
> স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব নাধর্মং বোঢুমর্হসি ॥
> প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ।
> ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাদ্ রামং বিসর্জয় ॥ আদি, ২১/৭-৮

রাজা দশরথ তখন পূর্ব-প্রতিশ্রুতি পালনার্থে তাঁর প্রাণপ্রিয় আত্মজদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

বনবাসকালে রামচন্দ্র রাক্ষসদের দ্বারা নিপীড়িত ঋষিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি রাক্ষসদের বধ করে ধর্মপ্রাণ ঋষিদের রক্ষা করবেন। কিন্তু সীতাদেবী রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন, বনবাসকালে অহিংস ধর্ম পালনের জন্য। তিনি রামচন্দ্রকে বললেন: হে বীর, শত্রুতা না করলে দণ্ডকাবাসী রাক্ষসদের হত্যার বুদ্ধি তুমি করো না। বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

> বুদ্ধির্বৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্ ।
> অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে ॥ অরণ্য, ৯/২৯

তখন রামচন্দ্র সীতাকে বললেন: হে সীতা, এই দণ্ডকারণ্যে ঋষিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীবন থাকতে তা আমি ফিরিয়ে নিতে পারব না। হে সীতা তোমাকে, লক্ষ্মণকে এমন কি আমার প্রাণকেও আমি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু মুনিদের কাছে প্রদত্ত অভীষ্ট সত্য তথা প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ করতে পারি না। বিশেষত ব্রাহ্মণদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ত্যাগ করতে পারব না। ঋষিদের রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

> ঋষীণাং দণ্ডকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাত্মজে।
> সংশ্রুত্য চ ন শক্ষ্যামি জীবমানঃ প্রতিশ্রবম্ ॥
> মুনীনামন্যথাকর্তুং সত্যমিষ্টং হি মে সদা।
> অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্ ॥
> ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ।
> তদবশ্যং ময়া কার্যমৃষীণাং পরিপালনম্ ॥ অরণ্য, ১০/১৭-১৯

লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবকে বলেছেন:

যে রাজা উপকারী মিত্রদের উপকার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন করেন না, তার চেয়ে অধিক নৃশংস আর নেই। একটি অশ্বদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন না করলে তাকে শত অশ্বহত্যার পাপে পাপী হতে হয়। একটি গাভী দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেটি পালন না করলে সহস্র গাভী হত্যার পাপ হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেটি পালন না করলে তাতে আত্মহত্যা ও স্বজনবধের পাপভাগী হতে হয়।

> যস্তু রাজা স্থিতো' ধর্মে মিত্রাণামুপকারিণাম্ ।
> মিথ্যা প্রতিজ্ঞাং কুরুতে কো নৃশংসতরস্ততঃ॥
> শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং তু গবানৃতে।
> আত্মানং স্বজনং হন্তি পুরুষঃ পুরুষানৃতে ॥ কিষ্কিন্ধা, ৩৪/৮-৯

পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালনীয়। পূর্ব-প্রতিশ্রুতি পালনের এই নৈতিক গুণটি বর্তমান সময়ে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ও অনুকরণীয় আদর্শ।

জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা

জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা আছে *রামায়ণে*। বনবাসে যাওয়ার পথে কোশল দেশ অতিক্রম করার সময় রামচন্দ্রের নিজ জন্মভূমির প্রতি আকুলতা, আবার কবে এই জন্মভূমিতে তিনি ফিরে আসবেন –এই ভেবে আকুল হয়ে তিনি সারথি সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করেছেন: কবে আমি আবার সরযূর এই পুষ্পিত বনে ফিরে আসব?

> কদাহং পুনরাগম্য সরয্বাঃ পুষ্পিতে বনে। অযোধ্যা, ৪৯/১৫

অযোধ্যা নগরী ও সরযূ নদী রামচন্দ্রের কাছে মায়ের তুল্য। সীতা উদ্ধার করে ফেরার পথে অনেকদিন পর অযোধ্যা নগরীকে দেখে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলেন: এই সেই সরযূনদী, এই আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা, একে প্রণাম কর।

এষা সা দৃশ্যতে সীতে সরয্যূপমালিনী।
এষা সা দৃশ্যতে সীতে রাজধানী পিতুর্মম।
অযোধ্যাং কুরু বৈদেহি প্রণামং পুনরাগতা ॥ যুদ্ধ, ১২৩/ ৫৪-৫৫

বাল্মীকি *রামায়ণের* বঙ্গীয় সংস্করণে দেশের প্রতি রামচন্দ্রের অকৃত্রিম ভালোবাসার উল্লেখ আছে। সেখানে দেশ ও মা সমার্থক হয়েছে। মাতৃভূমির উদ্দেশে ভালোবাসার প্রসঙ্গে বহুশ্রুত বহুকথিত সেই অবিনাশী উক্তিটি – 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' – জননী-জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ।

যুগে যুগে জন্মভূমিকে মাতৃজ্ঞানে ভালোবেসে স্তুতি করেছেন নানা কবি-সাহিত্যিক। জন্মভূমিকে ভালোবাসা নৈতিক শিক্ষার একটি অন্যতম দিক। *রামায়ণে* বিধৃত জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা শুধু বর্তমানকালে নয়, যুগে যুগে মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবে।

গুরুর প্রতি বিনীত হতে হবে

একজন আদর্শ ব্যক্তি সবসময় গুরুর প্রতি বিনয়ী হন। গুরুর প্রতি শিষ্যের কেমন আচরণ হওয়া উচিত, গুরুকে কতটা মর্যাদা দান করা উচিত – *রামায়ণের* রামচন্দ্র তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিশ্বামিত্র ছিলেন রামচন্দ্রের অস্ত্রগুরু। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে রামচন্দ্র তপোবনবাসীদের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করার জন্য তাড়কা বধ করেছিলেন। তাড়কা বধের পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বিশ্বামিত্রের চরণে প্রণাম করে বলেন: হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার ভৃত্যরূপে আমরা দুজন উপস্থিত হয়েছি। আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ আদেশ আমরা পালন করব?

ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাম কিম্ ॥ আদি, ৩১/৪

রামচন্দ্রের এ উক্তিতে গুরুজনের প্রতি বিনয় প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক স্থাপনে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গুরুর প্রতি বিনয়ী না হলে যথাযথ জ্ঞানার্জন হয় না।

রামায়ণ এক মহান মহাকাব্য। অনেক আদর্শ, অনেক দর্শন, অনেক নীতিবাক্যের সমন্বয় ঘটেছে এই মহাকাব্যে। এ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সকল কথার সম্মিলন সম্ভব নয়। আমার সীমাবদ্ধতার কথা আমি জানি। নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে একটা সমগ্রতা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। *রামায়ণ* লিপিবদ্ধ হয়েছিল এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, এক আদর্শবান মানুষের চরিত্রচিত্রণে। বাল্মীকি *রামায়ণ* লেখার প্রারম্ভে নারদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন বর্তমান সময়ে (সাম্প্রতং লোকে) একজন আদর্শ মানুষের কথা। সেই সমন্বিত আদর্শগুলোর কথাও বলেছিলেন বাল্মীকি। গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্, দৃঢ়ব্রত, চরিত্রবান, সর্বভূতহিত, বিদ্বান, সমর্থবান, প্রিয়দর্শন, আত্মবান, জিতক্রোধ, দ্যুতিমান, অসূয়াহীন (অনসূয়), যুদ্ধকালে ক্রুদ্ধ কাকে দেখলে দেবতারাও ভয় পায়।[৪] নারদ বলেছিলেন, এমন একজনই আছেন, যিনি রঘুপতি রাম। এই আদর্শ চরিত্রের বর্ণনায় অনেক আদর্শের কথা যে আসবেই, সেটা স্বাভাবিক। এক সময়ে কাব্যনির্মাণের একটা উদ্দেশ্য ছিল, কাব্যপাঠের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে প্রবর্তিত করা। ধর্মগ্রন্থের ভাষা, তার গভীরার্থ, উপদেশ সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য নয়। কিন্তু সেই একই উদ্দেশ্য, উপদেশ যদি কাব্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় তাহলে সকল মানুষের কাছে তা সহজবোধ্য হবে, মানুষ তা আনন্দে গ্রহণ করবে। *রামায়ণ* পড়ে মানুষ বুঝতে পারবে রামের মতো আচরণ করতে হবে, রাবণের মতো নয়।[৫]

রামায়ণ আমাদের কাছে সেই মহাকাব্য যেখানে মানবিক চরিত্র এবং গার্হস্থ্য ধর্মের মাধ্যমে বহুমুখী দর্শন, বিবিধ উপদেশ ও নানা নৈতিক শিক্ষা প্রতিভাত হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের উন্নত আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে রামায়ণে। যুগ যুগ ধরে *রামায়ণের* এই নৈতিক শিক্ষার পবিত্র পুণ্যময় অমৃতপ্রবাহ মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়। সেই কতকাল আগে রচিত হয়েছিল *রামায়ণ*, আজও সমভাবে তার কথা দীপ্যমান। *রামায়ণের* নৈতিক শিক্ষায় জীবনবিমুখতা নেই, বরং তা জীবন ও জগৎ সম্পৃক্ত। এই নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা পুণ্যতোয়া নদীর মতো বহমান।

তথ্যনির্দেশ

১. বাল্মীকির অমর সৃষ্টি *রামায়ণম্*। রামায়ণের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ। ভারতীয় ঐতিহ্য-পরম্পরায় *রামায়ণ* প্রথম মানবিক কাব্য, আদি কাব্য এবং বাল্মীকি আদি কবি। চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে *রামায়ণে*। সাতটি কাণ্ডে বিভাজিত। কাণ্ডগুলি যথাক্রমে আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধা, সুন্দর, যুদ্ধ ও উত্তর কাণ্ড। প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি-পরিচয়ে প্রথমে কাণ্ডের নাম এবং পরে দুটি সংখ্যায় যথাক্রমে সর্গ ও শ্লোকসংখ্যা নির্দেশিত। উদ্ধৃতিসমূহ গৃহীত হয়েছে ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত *মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত রামায়ণম্* (২ খণ্ডে সম্পূর্ণ) থেকে।

রামায়ণের জনপ্রিয়তা অপরিসীম। দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে রাজার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র সমানভাবে সমাদৃত ও পঠিত এ গ্রন্থটি। ভারতবর্ষের সকল আধুনিক ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ হয়েছে। বাঙালির ঘরে ঘরে অধিক পঠিত রামায়ণটি কৃত্তিবাস (১৫শ শতক) অনূদিত। ভারতের বাইরে সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় – ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড), মালয়েশিয়া, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, চীন, সিংহলে (শ্রীলঙ্কায়) *রামায়ণের* প্রচার ও প্রসার হয়েছে। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ভাষাসহ পৃথিবীর সকল প্রতিষ্ঠিত ভাষায়ও *রামায়ণের* অনুবাদ হয়েছে।

রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: অযোধ্যার রাজা দশরথ। তাঁর তিন স্ত্রী (কৌসল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা) এবং চার পুত্র (রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন)। কৌসল্যার পুত্র রাম, কৈকেয়ীপুত্র ভরত এবং সুমিত্রার যমজপুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করলেন। কিন্তু কৈকেয়ী বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর নিজপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং রামের চৌদ্দ বছর বনবাস চাইলেন। একসময় কৈকেয়ীর কোনো কাজে সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ তাঁকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী প্রতিশ্রুত সেই সুযোগের ব্যবহার করলেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে গেলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন ভাই লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতা। দুঃখে হতাশায় দশরথের মৃত্যু হলো। এ সব ঘটনার সময় ভরত মামাবাড়িতে ছিলেন। তিনি ফিরে এসে সব জানলেন। মায়ের কার্যে তিনি ব্যথিত, লজ্জিত ও অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি রামকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। বনবাসের শেষ বছরে লঙ্কার রাক্ষসরাজা রাবণ সীতাকে হরণ করেন। সীতার অন্বেষণে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। সুগ্রীব ছিলেন কিষ্কিন্ধার বানররাজা বালির ভাই। রাম বালিকে হত্যা করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজা করলেন। সুগ্রীবের বানরবাহিনী সমস্ত দিকে সীতার অন্বেষণ করতে লাগল। অবশেষে সুগ্রীবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অত্যন্ত শক্তিশালী হনুমান সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় যেতে সক্ষম হলেন। তিনি সীতার সন্ধান নিয়ে ফিরে এলেন। রামচন্দ্র বানরবাহিনীকে নিয়ে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় পৌঁছে গেলেন। রাম-রাবণের বানর-রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে রাবণ সবংশ ধ্বংস হলেন। সীতা উদ্ধার হলো। কিন্তু রাবণ-নিগৃহীত সীতাকে গ্রহণ করতে রাম অস্বীকার করলেন। অপমানে হতাশায় গ্লানিতে সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সীতা অগ্নিদগ্ধ হলেন না। তারপর অগ্নিপরিশুদ্ধ সীতাকে নিয়ে রাম অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে বসলেন। কিছুকাল পর সীতা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। এ সময়ে প্রজাদের মধ্যে সীতাকে নিয়ে নানা বিরূপ সমালোচনা হতে লাগল। রাবণগৃহে সীতার দীর্ঘকাল বাস এই সমালোচনার কারণ। এই মর্মান্তিক কথা রামচন্দ্র শুনলেন। তিনি প্রজানুরঞ্জক শাসক। প্রজাদের মনোরঞ্জন তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। প্রজাদের কাছে রাজার আদর্শ ও চরিত্র অনুকরণীয়। তাই সীতাকে শুদ্ধ পবিত্র জেনেও তিনি লোকনিন্দাভয়ে তাঁর নির্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে তমসাতীরে বাল্মীকির আশ্রমের কাছে রেখে এলেন। বাল্মীকি সীতাকে আশ্রয় দিলেন। বাল্মীকির তপোবনে সীতার যমজ সন্তান লব-কুশের জন্ম হলো। এক সময় রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞস্থলে তিনি ধর্মপত্নীরূপে সীতার স্বর্ণপ্রতিমা স্থাপন করলেন। এই যজ্ঞে অনেক মুনি-ঋষি, রাজা আমন্ত্রিত হয়ে আগমন করেন। বাল্মীকি সীতা ও লব-কুশসহ যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ইতোমধ্যে বার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পুত্রদের সঙ্গে রামের পরিচয় হলো। মহর্ষি বাল্মীকি সীতার চরিত্র পরিশুদ্ধ ঘোষণা করে রামকে গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু রামচন্দ্র সীতাকে পরিশুদ্ধতার প্রমাণ দিতে বললেন। তখন সীতা সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সর্বসম্মুখে বললেন, তিনি কায়মনোবাক্যে সতত রামের অর্চনা করেছেন। রাম ব্যতিরেকে তিনি অন্য কাউকে কখনও মনে স্থান দেননি। তাঁর এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে ধরিত্রী দেবী যেন তাঁকে বিবর প্রদান করেন। সীতা এ প্রকার শপথবাক্য উচ্চারণ করতে থাকলে ধরাতল থেকে একটি দিব্য সিংহাসন উঠে এল। এই সিংহাসনে বসে তিনি পৃথ্বীতলে বিলীন হয়ে গেলেন। সীতাবিহীন পৃথিবীতে রামচন্দ্র আরও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। তারপর পুত্রদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে একদিন ইহলোক ত্যাগ করে দিব্যধামে গমন করেন।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামায়ণ', *প্রাচীন সাহিত্য*, রবীন্দ্র সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭১২

৩. ঐ, পৃ. ৭১৩

৪. কো' স্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্ ।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ ॥
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে ॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থো' সি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্ ॥ আদি, ১/২-৫

৫. চতুবর্ণফলপ্রাপ্তির্হি কাব্যতো রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন রাবণাদিবদিত্যাদিকৃত্যাকৃত্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপদেশদ্বারেণ সুপ্রতীতৈব। –সাহিত্যদর্পণঃ, প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ, পৃষ্ঠা ৫।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বিশ্বনাথকবিরাজকৃতঃ *সাহিত্যদর্পণঃ*, অধ্যাপক ড. শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়কৃত বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা, পুস্তকশ্রী, কলিকাতা

মহর্ষি বাল্মীকিকৃত রামায়ণম্, ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত, (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) প্রথম সংস্করণ, নিউ লাইট, কলকাতা, ১৯৭৬

অমলেশ ভট্টাচার্য, *রামায়ণ কথা*, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, বইপাড়া পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ২০১১

নারায়ণ, *হিতোপদেশ*, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (১৩শ খণ্ড), প্রসূন বসু, নির্বাহী সম্পাদক, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, *আমাদের পরিচয়*, বীণা লাইব্রেরী, প্রথম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৪১

শ্রীসুকুমার সেন, *রামকথার প্রাক্-ইতিহাস*, জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩-এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা, ১৯৭৭

সুখময় ভট্টাচার্য, *রামায়ণের* চরিতাবলী, আনন্দ, কলকাতা, ১৩৭৬

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮

ড. করুণাসিন্ধু দাস, *সংস্কৃত সাহিত্য পরিক্রমা*, রত্নাবলী ৩৯-এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪১০

গৌরীনাথ শাস্ত্রী, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, সারস্বত লাইব্রেরী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০০

জাহ্নবীচরণ ভৌমিক ও ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, সং+স্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮২

ড. রামেশ্বর শ', *সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য: সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১১

শিপ্রা দত্ত, *চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত*, কলিকাতা, ১৩৮৩

ড. স্বস্তিকা দত্ত, *রামায়ণ সমীক্ষা – জীবন ও দর্শন*, কলিকাতা, ১৯৭৯